এসো নব উদ্যমে নববর্ষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

শুভ নববর্ষ। সবাকে বৈশাখী শুভেচ্ছা। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গা বাঙলা নববর্ষ। বৈশাখ ১৪১৪বাঙলা তার যাত্রা শুরু করেছে ১৪ এপ্রিল ২০০৭ইং (শনিবার)। আমাদের পুরোজাতিসহ বিশ্বের সকল প্রবাসী বাঙলাভাষাভাষীগন আজ শেকড়ের টান অনুভব করবেন একটু বেশী। মুলউৎসের সন্ধানে বাঙলা বর্ষবরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। পাঠক বন্ধুদের বাঙলা নববর্ষে চৈতীফুলের গন্ধভরা শুভেচ্ছা দিচ্ছি। গত বছরটি নানা ঘটনায়, অর্জনে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপুর্ণ বছর ছিলো। জাতীয় জীবনে প্রথমে ছিলো এক অসহনীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। সে অস্থিরতা থেকে জাতি কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিশাল অর্জন তা ড. মোহাম্মদ ইউনুসের শান্তিতে নোবেল বিজয় এবং আমাদের ইয়ং টাইগাররা ক্রিকেটে সুপার এইটে উঠে এসেছে। বিশ্বকে লাগিয়ে দিয়েছে তাক। এ পর্যন্ত টাইগারদের পারফরমেন্স ও আমাদের দারুণভাবে আলোড়িত, আন্দোলিত এবং আশান্বিত করেছে। অতএব এবার তো অবশ্যই আমরা বলতে পারি ‘আমরা ও পারি’।। চলতি বছরটিতেও আমরা আরও বিশেষ অর্জন আশা করি। পুরো বছর জুড়ে আপনার সুস্বাস্থ্য ও সফলতা কামনা মরুপলাশ এর পক্ষ হতে। এসো নব উদ্যমে নববর্ষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ। পহেলা বৈশাখ১৪১৪ এর চিত্র দুইভাবে দু’জন শিল্পী এঁকেছেন। বদরুল আলম রতন এবং সাইফ মুন্না। তাঁদের আন্তরিকতার জন্য মরুপলাশ এর নববর্ষের শুভেচ্ছা। নববর্ষের অনেক লেখাই পেয়েছি, তবে তা অনেক দেরীতে। যাদের লেখাগুলো সংকলিত করতে পারলাম না। সে জন্য মরুপলাশ এর সীমাহীন দুঃখবোধ থেকেই গেলো। তবুও সুপ্রিয় লেখক বন্ধুদের আশাহীন করতে আমরা চাইনা। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আপনাদের লেখাগুলো অন্য একটি আইকনে প্রকাশিত হবে। দয়া করে মরুপলাশ এ নজর রাখুন। মরুপলাশ এর পক্ষ হতে এবার আরও দুটি অঙ্গা প্রকাশনা চালু করেছি-মরুদিগন্ত এবং তেপান্তর। তেপান্তর আইকনে ক্লিক করে দেখার জন্য সবাকে আমন্ত্রণ। উদ্দেশ্য বেশী বেশী লেখকদের স্থান করে দেয়া। সুপ্রিয় পাঠক আপনাদের মূল্যবান সময় বাঁচানোর জন্যে বলছি, শুধুমাত্র পিডিএফ ফাইলগুলো সরাসরি না খুলতে চেয়ে আপনার পিসিতে ডাউনলোড করে নিন। সবার জন্যে থাকলো আবারও বাঙলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক- মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর, মোহনা, বৈশাখী, তেপান্তর, মরুদিগন্ত।
রিয়াদ, সউদী আরব।
১লা বৈশাখ ১৪১৪বাঙলা (শনিবার) ১৪এপ্রিল ২০০৭ইং
Email: marupalash@gmail.com
www.marupalash.com

বৈশাখের এই বিশেষ আয়োজনে যে সকল লেখক বন্ধুরা অংশ গ্রহণ করেছেন...প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এ এফ এম ফতেউল বারী রাজা, পীযুষ কান্তিরায় চৌধুরী, নুরুন্নাহার মুন্নি, সাইফ মুন্না এবং দেওয়ান আবদুল বাসেত।

পহেলা বৈশাখ নববর্ষ ও বর্ষপঞ্জির ইতিকথা

প্রকৌঃ দেলোয়ার হোসেন

আর দশটা বিকেলের মত একটা সাদামাটা বিকেল। লাল সূর্যটা ঠিক পোড়া রুটির মত আকার ধারণ করেছে। ২৪ ঘন্টার এই সময়টা দিন আর রাতের মিলনের সময়। আর তাই কিছুটা উদাসীনতা মানুষকে কেমন যেন আনমনা করে দেয়। নীল একটা মলাটের বই হাতে নিয়ে বারান্দার দোলনায় দোল খাচ্ছে একজন তরুনী। হঠাৎ তার চোখ পড়ে নিচের দিকে। একখানা কালোগাড়ি এসে বাসার সামনে থামল। হালকা নীল রঙের স্যুট পরা এক যুবক বাসার সিঁড়িতে পা রাখল। চমৎকার সুন্দর সপ্রতিভ যুবক। ক্ষণিকের জন্যে চোখ বন্ধ করতেই মনে পড়ল গত বছরের কথা। গায়ের ফর্সা রঙের সাথে বেগুনী পাঞ্চাবী পরা এক তরুণ বকুল তলায় দরাজ গলায় গান ধরেছে 'এসো এসো হে বৈশাখ' গানটি তৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়েছিলো স্বপ্নলোকে। তৃষ্ণার উদাসীনতা হঠাৎ বদলে গেল।

মনে পড়ে গেল আবীরের সাথে তার প্রথম পরিচয়ের কথা। তরুন আবীর গত বৈশাখে বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী পরে ১লা বৈশাখ ১৪১২ বাং তার মন কেড়ে ছিলো কাল বৈশাখীর মতোই তাকে ভালোবাসার কথা শুনিয়ে ছিল আবীর। মাত্র দু'দিন পর ফিরে আসবে সে পহেলা বৈশাখ। বর্ষবরণের নানা অনুষ্ঠানে ওরা সবার সাথে মিশে একাকার হবে, তখন তার পরনে নীল স্যুটের বদলে বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী থাকবে, তৃষ্ণার পোশাক হবে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। ওরা দু'জন হবে স্বপ্নের রাজপুত্র -রাজকন্যা। তাদের চার পাশে শুধুই আনন্দলোক শুধু তারা নয় সকল বাঙালী সারা দেশ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করবে বাংলা নববর্ষ। চারদিকে লাল পাড়ের সাদা শাড়ী আর বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী পরা তরুন -তরুনীর দল। ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত , ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণ সার্বজনীন বাঙালী উৎসব।

তৃষ্ণাকে আন্দোলিত এই নববর্ষ। তৃষ্ণা আবীরের মতো কোটি কোটি বাঙ্গালীর প্রিয় দিন পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। অন্যদিকে পহেলা জানুয়ারীতে আমাদের দেশে উদযাপিত হয় অবশিষ্ট খ্রীষ্ট বা ইংরেজী নববর্ষ। পহেলা বৈশাখের মতো সেদিন সরকারি ছুটি থাকে না, তবে পূর্ববর্তী রাতের মধ্যপ্রহরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুসারে নগরীর কিছু মানুষ বেশ ঘটা করে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন করবে, আতশবাজী পোড়াবে, উদ্দাম ব্যান্ড আর হৈ চৈ করে রাতটি তারা কাটিয়ে দেবে।

থার্টি ফার্স্ট নাইট , বাংলা, বাঙ্গালীকে নাড়া না দিলেও, দিনক্ষণ তারিখের হিসেবের জন্যে বাঙ্গালীরা এখনও নির্ভর করে এই বর্ষপঞ্জিটির ওপর। জাতীয় জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খ্রীষ্টিয় সালের দিনপঞ্জির উপর নির্ভরশীল। যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর। ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত অনেকের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য কালচারে আসক্ত লোকজনের বেলেল্লাপনা। পহেলা জানুয়ারিতে সরকারি ছুটি না থাকলেও এই ইংরেজী সাল বা খ্রীস্টাব্দ অনুযায়ী আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

বর্ষপঞ্জির বিচারে আমরা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান এক জাতি। আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নয়, একাধারে তিনটি কাল বা ক্যালেন্ডার প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই তিনটি সাল হলো খ্রীষ্টাব্দ , বঙ্গাব্দ এবং হিজরী সন। আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই তিনটি সালের ভূমিকা অপরিসীম। এই ক্যালেন্ডার বর্ষপঞ্জি আমাদের জীবনে কিভাবে এলো সে কথাই এই প্রবন্ধে আমরা আজ জানতে চেষ্টা করবো। সৌর বর্ষ ও চন্দ্রবর্ষের উৎপত্তি এবং যোগ সূত্র নিয়ে আমরা আলাপ করবো । কাজটি আমরা শুরু করতে চাই সময় গণণার পথ ধরে। পশ্চিম বিশ্বে একটি সম্পূর্ণ দিন আর একটি সম্পূর্ণ রাতের পূর্ণচক্রের মেয়াদ ছব্বিশ ঘন্টা আমাদের বাংলায় অষ্টপ্রহর। চলুন জানতে চেষ্টা করি ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি ও জন্ম রহস্য নিয়ে।

ক্যালেন্ডার কথা

ঠিক ঠিক দিন তারিখ জানতে আমরা ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাই। কিন্তু এই ক্যালেন্ডার কে কবে আবিষ্কার করেছিল তা কি আমাদের জানা আছে ?
ক্যালেন্ডার আবিষ্কার হয় সেই সুপ্রাচীনকালে। তখনকার মানুষ সূর্যের উদয়-অস্ত দেখে সর্বপ্রথম অনুভব করে যে, সকাল-সন্ধ্যা নির্ভর করে সূর্যের ওপর। বহু বছর পর দিনক্ষণকে ডিঙিয়ে মানুষ চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে শুরু করল মাস গণনা। তারপর ঋতু পরিক্রমার হিসাব করে শুরু করল বছর গণনা।

এ হিসাব ধরে রাখতে গিয়ে সর্বপ্রথম ক্যালেন্ডার আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন মিসরে। ক্যালেন্ডার প্রকাশের ফলে মানুষ জানল ১২ মাসে এক বছর আর ত্রিশ দিনে এক মাস। এভাবে বছর শেষে বাড়তি দিন জুড়ে বছরের হিসাব দাঁড়াল ৩৬৫ দিন। তখনকার দিনে গ্রিসের হিসাব অবশ্য চান্দ্রমাসে হতো। তাদের হিসাব ছিল প্রতি আট বছর অন্তর দিন-মাস যোগ দেওয়া। ৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আদেশে ক্যালেন্ডারের সংস্কার কাজ সর্বপ্রথম শুরু হয়। এ কাজে সাহায্য করেন আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদ সোমি গেনিস। এই ক্যালেন্ডার তৈরি হয় সূর্যের চারদিকে পৃথিবী পরিক্রমার ওপর নির্ভর করে। এর নাম দেওয়া হয় সৌর বছর।

সোমিগেনিস ঠিক করলেন প্রতি বছরে থাকবে ৩৬৫ দিন এবং চার বছর অন্তর বছর হবে ৩৬৬ দিনের। কারণ প্রতি বছর যে কতিপয় ঘন্টা বাদ যাচ্ছে চার বছর অন্তর ওই বাদ যাওয়া ঘন্টা মিলে একটা দিনের সৃষ্টি হয়। চতুর্থ বছরের নাম হলো লিপ ইয়ার। বছরের ১২ মাসের মধ্যে ৭টি মাস ৩১ দিনের আর চারটি ৩০ দিনের এবং অবশিষ্ট মাস ২৮ দিনের। শুধু লিপ ইয়ারে এ মাস হবে ২৯ দিনের। সুদীর্ঘ ১৬০০ বছর এ ক্যালেন্ডার চালু থাকার পর ১০ দিনের গন্ডোগোল ধরা পড়ে পৃথিবীর সূর্যের প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫.২৪২২ দিন। অথ্যাৎ ১০০০ বছরে সাত দিন অতিরিক্ত ধরা হয়েছে। এই গোজামিল ঠিক করতে ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি ঠিক করলেন, শতাব্দীর যে বছর ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হবে না সে বছর লিপ ইয়ার হবে না। অথ্যাৎ সে বছর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনের হবে। এর ফলে ১৮০০, ১৯০০, ২১০০ এ বছরগুলো লিপ ইয়ার হবে না। এই ক্যালেন্ডার গ্রেগরি ক্যালেন্ডার হিসাবে পরিচিত।

১৫৭২ সালে তৃতীয় গ্রেগরি পোপ নিযুক্ত হওয়ার পর খেয়াল করে দেখলেন যে, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৫৪৫ সালের মধ্যেই মহাবিষুব বা Vernal Equinox দশ দিন সরে গেছে। ফলে পবিত্র ইস্টারের দিনও গেছে পালটে। কারণ জুলিয়ান সৌরবর্ষ প্রকৃত সৌরবর্ষের তুলনায় ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড বেশী। প্রতি বছর এইসময় বেড়ে বেড়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। প্রতি চারশো বছরে বেড়ে গেছে ৩.১২ দিন। তাই ১৫৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক হল মহাবিষুব বা ভার্নাল ইকুইনক্সকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ২১ মার্চ। সৌরবছরের মান ঠিক করা হল ৩৬৫.২৪২২। চালু হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

১৭৫২ সালে আমেরিকায় জুলিয়ান বাতিল করে গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জী চালু করার সময় দশটা দিন বাদ দিতে হল ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে। আপাততঃ গ্রেগরির নামাঙ্কিত এই বর্ষপঞ্জী সাধারনভাবে চালু থাকলো। এরমধ্যে অবশ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফরাসি বিপবের সময় চালু করা হয় এক নতুন ক্যালেন্ডার। ১৭৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হওয়া ফরাসি প্রজাতন্ত্রের বর্ষপঞ্জী বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। সময় অর্থাৎ সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, পল, দন্ড, পহর হিসাবে পৃথিবীর সম্পূর্ণ এক আবর্তন কে ভাগ করা হয়। তবে সময় গণনার একক এক এক দেশে এক এক রকম। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে অষ্টপ্রহর মিলে একদিন হয়।

মজার কথা হলো, পশ্চিমের এই চব্বিশ ঘন্টার মূলে ছিল সুমের সভ্যতার ব্যবাহার করা বিখ্যাত সংখ্যা ১২ দিন। আর রাতকে ওই ১২ঘন্টায় ভাগ করেই ২৪ ঘন্টার উৎপত্তি। সুমের ব্যাবিলনের মানুষ মহাকাশকে ভাগ করেছিল ১২ টি নক্ষত্রমন্ডলী অনুসারে, প্রতিটি মন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল কিছু কমবেশী ৩০ ডিগ্রি জায়গা। ফলে ৩৬০ ডিগ্রির বৃত্তের আকাশ পটে জেগে থাকতো এক অপূর্ব রাশিচক্র। বছরকেও ভাগ করা হয়েছিল ১২ মাসে। কিছু কমবেশী ৩০ দিন নিয়ে একটি মাস। সূর্য আর চাঁদের গতিপথ নিয়ে সে এক মহৎ আষ্কিারের গল্প।

বর্ষপঞ্জি যেভাবে সৃষ্টি হলো!

একদিকে যেমন দিনকে ভেঙ্গে ফেলা হল অন্যদিকে কয়েকটি দিন মিলিয়ে 'গুচ্ছ' তৈরী করার কাজও করেছে প্রাচীন সভ্যতার বৈজ্ঞানিকের দল। অবশ্য এই দুটো কাজ সে করেছে নিজের প্রয়োজনে, একান্তই নিজের সুবিধা অনুযায়ী। প্রকৃতির অনুশাসন এক্ষেত্রে তাকে মানতে হয়নি। দু'টি হাটবারের মাঝে যে ক'টা দিন পড়ে তাই নিয়ে একটা গুচ্ছ ভাবা যেতে পারে অত্যন্ত সহজেই। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে এই গুচ্ছ হল চারদিনের, আসিরীয় সভ্যতার সুবিধা ছয়দিনের গুচ্ছে, প্রাচীন মিসরে দশদিন। প্রাচীন রোমে হাট বসত আটদিন অন্তর। শেষ পর্যন্ত সাতদিনের গুচ্ছ 'সপ্তাহ' চালু করল ব্যবিলনের মানুষ। তার একটা কারণ যেমন চান্দ্রমাসকে চারভাগে ভাগ করে ফেলার পক্ষে ওই সাতদিনের গুচ্ছ সুবিধাজনক অন্য কারণ হয়তো প্রাচীন ব্যবিলনের মানুষ ৭ সংখ্যাটিকে পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করত। অনুমান করা হয় সেদিনের মনুষের জানা সাতটি গ্রহের সংখ্যাই সম্ভবত এই পবিত্র বিশ্বাসের ভিত্তি। সপ্তাহ বা প্রহরের ভাঙ্গাগড়ায় মানুষের ভূমিকা প্রধান। মাসের হিসাবে কিন্তু তা নয়। চাঁদের কলারহ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করে মানুষ এই সংখ্যাটি জেনেছে। জেনেছে একটি অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যার মাঝখানে আছে সাড়ে উনত্রিশ দিনের ব্যবধান।

প্রাচীনকালে মানুষ অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে সময়টা প্রায় মেলে মহিলাদের শারীরিক ঋতু চক্রের সঙ্গে। প্রকৃতির অঙ্ক অবশ্য আরও অনেক জটিল, সে জটিল রাশির খোঁজ পেয়েছে মানুষ অনেক অনেক পরে। জেনেছে চাঁদের এই কলাক্রমের জন্য সময় লাগে ২৯,৫৩০৫৯ দিন। জটিলতার রাশির খোঁজে গিয়ে অপাতত লাভ নেই। একদিকে প্রকৃতির রং রূপের পরিবর্তন, জীবজন্তুর আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র লক্ষ্য করেছে মানুষ, অন্যদিকে তার আশ্চার্য মস্তিষ্ককে ব্যবহার করেছে এই বিচিত্র গণিতে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ যখন দূরদেশ থেকে উড়ে আসা সারসের ডাক শুনে ক্ষেতে লাঙ্গাল দেওয়া অথবা বীজ বপনের উপযোগী সময়কাল ঠিক করছে অথবা তাইওয়ানের কাছে রোটেল- টোব্যাগো দ্বীপের জেলেরা যখন সমুদ্রে উড়ুক্কা মাছের দেখা পেলে তবেই মাছ ধরার সয় হয়েছে বলে নৌকো নিয়ে বেরুচ্ছে।

মাছের দেখা না পেলে ফিরে আসছে শুকনো মুখে। ঠিক তারই পাশাপাশি চন্দ্র সূর্য আর নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য খ্রিঃ পূঃ দু'হাজার সালে, বর্তমানে ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ার অঞ্চলে প্রাচীন মানুষ তৈরী করেছে এক অকল্পনীয় স্থাপত্য। অনেকগুলো পাথর সাজিয়ে আর্শ্চায মানমন্দির ঝঃড়হব যবহমব. প্রাচীন ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জী হল মূলত মাসের যোগফল। কিছু ২৯ আর কিছু ৩০ দিনের মাস মিলিয়ে তৈরী হয়েছিল বছরের হিসাব। কিন্তু সমস্যা হয়েছে সেই মাস অনুযায়ী ঋতুকাল ঠিক করতে গিয়ে। কারণ, এরই মধ্যে মানুষ চাষাবাসের কাজ করতে গিয়ে ঋতুর গুরুত্ব বুঝে ফেলেছে। সমস্যা হল ঋতুর পরিবর্তন সূর্যের উপর নির্ভর করে চাঁদের উপর নয় অন্যদিকে মাসের হিসাব হয় চাঁদেরহ্রাসবৃদ্ধির উপর সূর্যের চলাচল এখানে অচল। সূর্য আর চাঁদের মধ্যে এই সর্ম্পকে স্থাপনের অঙ্কই আজ পর্যন্ত সব ক্যালেন্ডার বা পঞ্জীকার মূল উপজীব্য বিষয়। সুদূর ব্যবিলন সভ্যতার প্রারম্ভ থেকেই সাড়ে ২৯ দিনের মধ্যে নিবিড় সর্ম্পক পাতানোর জটিল অঙ্ক চলছে বিরামহীন।

নক্ষত্রের অবস্থান দেখে নক্ষত্র দিন মাস বা বছর নির্ধারণ করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মিলিয়ে দেখেছেন সৌর দিন মাস বছরের সঙ্গে চান্দ্রমাসের সঙ্গের। এই অঙ্কগুলো শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন যাবত। প্রাচীন মিসরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী তার। গণিতের প্রাধান্য দিয়েছেন সিরিয়াল বা লুব্ধক নক্ষত্রের অবস্থানকে। ব্যবিলন আর গ্রিসে যে সব প্রাজ্ঞ গণিতজ্ঞ এই কাজ করছিলেন তাদের মধ্যে মেটন ক্লিওট্রাটাস ইওডক্সাস হিরারকাস ক্যালিপাস স্মরণীয়। সৌর বছর আর চান্দ্রমাসের সর্ম্পক স্থাপনের এই অঙ্কই জন্ম দিল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ এর। নামগোত্রহীন একটি বাড়তি দিনকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ কোথাও কোথাও উৎসবে রূপ নিল। পশ্চিমের কোনও কোনও দেশে একসময় ওই বিশেষ দিনে নাকি কুমারী মেয়েরা বেরত তাদের পছন্দমতো পাত্র শিকার করতে। কুমারী মেয়েরা অপেক্ষা করতো কবে আসবে স্বপ্নে সে দিন ২৯ ফেব্রুয়ারি।

ইহুদী বর্ষপঞ্জী চান্দ্র ও সৌর আবর্তন এই দুটিকে স্বীকার করে তৈরী। ইসলাম গ্রহন করেছে চান্দ্রের অবস্থানকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে। ৬২২ খ্রিঃ ১৬ জুলাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেদিন মক্কা থেকে মদিনায় আসেন সেই দিনটি হল হিজরী বর্ষপঞ্জীর প্রথম দিন। বঙ্গাব্দের শুরু ৫৯৩ খ্রিঃ সালে। এই দিন থেকেই হিসাব করা হয়। হিজরী সন চান্দ্রমাসের বাংলা সাল সৌরমাসে গোনা হয় বলে দুই অব্দের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে প্রায় ১৪ বছরের যদিও বাংলাসন শরু হয়েছে ২৯ বছর আগে। বছরের। কারণ চান্দ্র বছরের থেকে সৌর বছর মোটামুটি ১০ দিন ২১ ঘন্টা ৩০ মিনিট বেশী। খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতকে মাঝামাঝি সময়ে জুলিয়াস সীজারের আমন্ত্রণে আলেকজান্দ্রিয়ার

জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনিসক মিসরীয় ক্যালেন্ডারের আদলে ঋতুকাল অনুসানে তৈরী করেন সোয়া ৩৬৫ দিনের সৌরবর্ষ। তৈরী হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে চালু আছে বা ছিল অসংখ্য বর্ষপঞ্জী। তার বিবরণ এই স্বল্পপরিসরে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। চীনদেশে আবিস্কৃত হয়েছে প্রায় নির্ভুল এক বর্ষপঞ্জী । দক্ষিণ আমেরিকায় অতিকায় মনোলিথ বা পাথরে ৫২টি সৌববর্ষের বিশাল চক্রাকার গণিত উৎকীর্ণ মায়াআজটেক সভ্যতার প্রচলিত ক্যালেন্ডার পাওয়া গেছে যাতে রয়েছে আঠারো মাসে এক বছরের হিসাব। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই চান্দ্র ও সুর্যের গতিবিধিকে আশ্রয় করে তৈরী হয়েছে বহু বর্ষপঞ্জী শতাব্দ, হিজিরা, বিলায়েতী, মগী, বঙ্গাব্দ, ফসলী তুর্কি, চৈতন্য অব্দ, বিক্রম সমবেত ও আরও অনেক বর্ষপঞ্জী।

প্রাচীন ভারতের তৈত্তিরীয় সংহিতার ৩৬০ দিনের সৌরবর্ষের উলেখ আছে। কিন্তু খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে বৃহস্পতি গ্রহ ও সুর্যের গতিপথকে সমন্বিত করে যে সুর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছে সেটিই প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী জ্যোতিবিদ্যার নমুনা। বৃহস্পতিগ্রহ প্রায় বারো বছরে সুর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে এক একটি রাশিতে তার প্রদক্ষিণের সময়কাল সুর্যের ১২টি রাশিতে প্রদক্ষিণ সময়ের প্রায় কাছাকাছি। ভারতীয় জ্যোতির্বিদহণ এই দুই সময়কালকে সমন্বিত করেছেন তাদের গণিতে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হিসাব আমাদের প্রথাবিদ্ধ পঞ্জিকার সঙ্গে অনেকটাই মেলে না, যতটা মেলে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাশ বা দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকার হিসাবের সঙ্গে কারণ মেঘনাদ সাহার সংশোধনী বাংলার প্রথাসিদ্ধ পঞ্জিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান পায়নি।

প্রস্তাবিত আধুনিক বর্ষপঞ্জি

একদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন রয়েছে তেমন অন্যদিকে রয়েছে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সুবিধা অসুবিধার ক্ষেত্র। যে কোনও প্রাচীনতম অথবা আাধুনিকতম বর্ষপঞ্জিকা তৈরী করার ক্ষেত্রে এই দুই এর গুরুত্বই সমান সমান। তাই আগামী দিনের পৃথিবীতে যে দুটি নতুন প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে তার মধ্যে এটি হল International Fixed Calendar.অন্যটি World Calendar. প্রথমটির ক্ষেত্রে বছরকে ভাগ করা হয়েছে তোরোটি মাসে। প্রতি মাসে আঠাশ দিন। তেরো নম্বর মাসটিকে ঢোকানো হয়েছে জুন ও জুলাই মাসের মাঝখানে। নাম দেওয়া হয়েছে ঋড়ষ. ২৮ ডিসেম্বরের পর একটি নামগোত্রহীন দিন যোগ করে বছর শেষ হচ্ছে ৩৬৫ দিনে। অধিবর্ষ বা লিপইয়ারে ওইরকম আর একটি দিন যোগ হবে ২৮ জুনের পরে।

প্রতিটি মাস শুরু হবে রোববার, শেষ হবে শনিবারে। সমালোচকরা বলেছেন বাণিজ্যিক বা অন্যান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ক্যালেন্ডারের অসুবিধা হল একে সমান চারভাগে ভাগ করা যাবে না। World Calendar এ অবশ্য সে অসুবিধা নেই। একানব্বই দিনের সমান চারটি ভাগের প্রত্যেকটিতে রয়েছে তিনটি করে মাস। প্রথম মাস ৩১ দিনের পরের দুটি ৩০ দিনের। ৩০ ডিসেম্বরের পর একটি নামগোত্রহীন দিন এবং অধিবর্ষে ওইরকম একটি দিন যোগ হবে ৩০ জুনের পর। এই হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারী এপ্রিল জুলাই আর অক্টোবরের পয়লা তারিখ হবে রোববার।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ১০ দিন বাদ দেওয়া হয়েছিল কেন ? বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

প্রাচীনকালে বর্ষ গণনার জন্য ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার এটার প্রচলন করেন। কিন্তু ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি XIII এক ডিক্রির মাধ্যমে সেই ক্যালেন্ডার সংশোধন করেন। এতে আগের ক্যালেন্ডার থেকে ১০ দিন বাদ দেওয়ার মুল কারণটি ছিল লিপইয়ারের হিসাবে গন্ডগোল। যেহেতু ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টার কয়েক সেকেন্ড কম সময়ে পুরো এক বছর হয় তাই প্রতি চতুর্থ বছরকে বলা হয় লিপইয়ার এবং সে বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এক দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইহা আগে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল এই হিসাবের একটু ভুল থেকে যায়। কারণ প্রতি চার বছরে লিপইয়ার ধরলে আবার কিছু সময় বাড়তি ধরা হয়ে যায়। এটা সংশোধনের জন্য আবার প্রতি ৪০০ বছরে তিনবার লিপইয়ার বাদ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

যেহেতু আগে সেটা করা হয়নি তাই ১৫৮২ সালে প্রথমে একবারে ১০ দিন বাদ দিয়ে ক্যালেন্ডারের হিসাব ঠিক করা হয়। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি ১২৮ বছরে প্রায় একদিনের ঘাটতি পড়ে। এর সংশোধনের জন্য ধরে নেওয়া হয় যে ২১ মার্চ হলো এমন একটি তারিখ যখন উত্তর গোলার্ধে দিন ও রাত সমান (ভার্নাল ইকুইনক্স)। আর যেহেতু সেটা স্থির করা হয়েছিল ৩২৫ খ্রিস্টব্দে সে জন্য হারানো দিনের সংখ্যা নিরূপনের জন্য হিসাবটি করা হয় এভাবে (১৫৮২-৩২৫) /১২৮=১০ দিন (প্রায়) এবং এটাই বাদ দিয়ে হিসাব ঠিক করা হয়। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসাবটি হলো যেসব সাল ৪ দিয়ে বিভাজ্য সেগুলো হবে লিপইয়ার কিন্তু ১০০ দিয়ে বিভাজ্য লিপইয়ার হবে না তবে ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হলে আবার লিপইয়ার হবে। যেমন ১৭০০, ১৮০০ ও ১৯০০ সাল লিপইয়ার ছিল না কিন্তু ২০০০ সাল ছিল লিপইয়ার। তবে এই হিসাবের একটু ভুল থেকে যায়, সেটা সংশোধানের জন্য বলা হয় কোনো বছর যদি ৪০০০ দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সেটা লিপইয়ার হবে না।

এই শেষ হিসাবটা অবশ্য এখনো সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। শুরুতে অনেকেই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মেনে নিতে চায়নি। তারা বলত আমাদের ১০ দিন ফিরিয়ে দাও। জারের রাশিয়া সেসময় ওই ক্যালেন্ডার মেনে নেয়নি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপবের পর পূর্বের ক্যালেন্ডার থেকে ১১ দিন বাদ দিয়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সেখানে চালু করা হয়।

বর্ষপঞ্জী নিয়ে না বলা ইতিহাস

মহাশক্তিধর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ জয়, মানবসভ্যতার পত্তন কিংবা বিনাশের মধ্যেই শুধু ইতিহাস সৃষ্টি হয় না। কখনো কখনো খুব ছোট্ট, আপত নগণ্য ঘটনাই একসময় জন্ম দেয় বিরাট ইতিহাস। আর তাই ইতিহাসে এমন কিছু গল্প আছে যা জানা সহজ নয়। সেসব অজানা ইতিহাস আর তার নেপথ্যের গল্প নিয়ে আজকের না বলা ইতিহাস পৃথিবীতে বিদ্যমান। খ্রিষ্টীয় দিন লিপি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে ১০টি দিন ১৫৮২ সালে ৫ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর তারিখ গুলো কোন পাত্তা নেই ইতিহাসের পাতায়।

খ্রিষ্টীয় সন থেকে হারিয়ে যাওয়া ১০টি দিন

১৫৮২ সাল ঘুম থেকে উঠে তারিখ মিলিয়ে দেখলেন, পাক্কা ১০ দিন পর ঘুম ভেঙ্গেছে আপনার! কেমন লাগবে তখন? ১৫৮২ সালে অক্টোবরে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতারই মুখোমুখি হয়েছিল লাখ লাখ ইউরোপবাসী, যাদের অনেকেই ভীষণ মুষড়ে পড়ে এ ঘটনায়। সমস্যার বীজটা রোপিত হয়েছিল ১৬২৮ বছর আগেই । খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ শতকে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রচলিত বর্ষপঞ্জির সংস্কার করে নতুন বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। এতেও থেকে যায় কিছু সূক্ষ্ম ভুল। সিজারের বর্ষপঞ্জির সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণের ব্যবধান ছিল ১১ মিনিট। ভুলের মাশুল দিতে প্রতি বছর ১১ মিনিট করে হারাতে হয় পৃথিবীকে। কালের আবর্তে এই সূক্ষ্ম ভুলটাই ১৬০০ বছর পর পরিণত হয় মহীরুহে।

বসন্তকালে সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমের নির্ধারিত সময়টা মার্চ থেকে স্থানান্তরিত হয় শীতকালে। কী ভয়ানক বিশৃঙ্খলা! সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসেন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি। সমস্যার কারণ খুঁজে বের করতে দক্ষ পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেন পোপ। ব্যাপক পরীক্ষা -নীরিক্ষা শেষে তার অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক একটি বর্ষপঞ্জি তৈরি ও চালুর সুপারিশ করেন। পোপ তাদের সুপারিশ গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য একটি আদেশ জারি করেন। সর্বকিছু নির্ধারিত ছকে ফিরিয়ে আনতে বর্ষপঞ্জি থেকে ১০দিন মুছে ফেলার প্রয়োজন পড়ে। সিদ্ধান্ত হয় ১০ দিন এগিয়ে নেওয়া হবে তারিখ।

ফলে ১৫৮২ সালের ৪ অক্টোবর পশ্চিম ইউরোপের মানুষ ঘুমাতে গেল এবং পরদিন ঘুম থেকে উঠে অবাক বিস্ময়ে আবিস্কার করল, সেদিনের তারিখটা ৫ নয়, ১৫ অক্টোবর! এ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয় মানুষ। পোপের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরে রীতিমতো দাঙ্গা বেধে যায়। কারণ, তাদের ধারণা ছিল, বর্ষবঞ্জি থেকে নয়, বরং নিজেদের আয়ুস্কালেরই ১০-১০টা দিন কেড়ে নেওয়ার পায়তারা করছেন পোপ! অন্যদিকে গ্রামসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে তারিখ বদলে যাওয়ার এ তথ্য ঠিকমতো পৌঁছায়নি।

অনেক রাষ্ট্রই দীর্ঘদিন এই পরিবর্তন মেনে নেয়নি। ফলে তৈরি হয় বিভ্রান্তির ধুম্রজাল। কিন্তু এই বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে যুক্তির কাছে। অবশেষে একদিন সবাই মেনে নেয় তা। সর্বত্র চালু হয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

বাংলা বর্ষপঞ্জী পহেলা বৈশাখ ও সাংস্কৃতির শাশ্বত ধারা ঃ

আর মাত্র হাতে গোনা কয়টিদিন পেরুলেই, লাল পাঁড়ের সাদা কোড়া তাঁতের শাড়িতে মেয়েরা সাজবে নিজস্ব ঢঙে। ছেলেরা বেগুনী অথবা উজ্জল অন্য কোন রঙের রঙীন পাঞ্জাবী কিংবা ফতুয়া পরে জমায়েত হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অথবা গানের আসরে মাতোয়ারা হবে রবীন্দ্র, নজরুল, লালনের গান নিয়ে। কাউকে বলে দিতে হবে না আজ পহেলা বৈশাখ। সর্বত্র একটা সাজ সাজ রব, কিন্তু অনেকেই জানে না এই উৎসবের উৎস কোথায় কবে থেকে শুরু হয়েছে মাটির সানকিতে, মাটির পাত্রে রান্না করা পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ সাথে বেগুন ভাজি। ছায়ানট তিনযুগ আগে রমনা বটমুলে শুরু করেছিলো নববর্ষ উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠান।

১৪ এপ্রিল ১লা বৈশাখের প্রথম প্রহরে সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আবহমান বাংলার শাশ্বত এই অনুষ্ঠান। পাক শাসক চক্র পাকিস্তান নামক অদ্ভুত রাষ্ট্রে বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি মনে করতো। মুর্খের দল জানতোনা বাংলা নববর্ষ শুরু করেছিলেন, আলাউদ্দীণ হোসেন শাহের পথ ধরে সম্রাট আকবর। পহেলা বৈশাখের সার্বজনীনতাকে একঘরে করে রাখার জোরালো প্রচেস্টা করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং বাঙালী জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী নয় এমন একটি স্বার্থান্বেষী মহল। বর্তমান বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ধারাটি ছেষট্টি সালে সানজিদা খাতুনের নেতৃত্বে ঘনীভুত হয়ে একটি সর্বজন গ্রাহ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ছায়নট কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি এখন সারা দেশময়। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বাঙ্গালীরাও এই উৎসবে সম্পৃক্ত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা একটু গভীরে প্রবেশ করে দেখব বাংলা সহ অন্যান্য দিন পঞ্জির শুরুর কথা।

যখন যাত্রা হলো শুরু (বর্তমান বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরুর কাহিনী)

দেড় হাজার বছর পুর্বের কথা, রাঢ়, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, গৌড় পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য ভাষা সংস্কৃতি এক অভিন্ন অথচ রাজ্য গুলো নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। গৌড় রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুর্বণে বাস করতো অসীম সাহসী ধীমান এক তরুন। তার সাহস আর মেধার তুলনা করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। সে ছিলো কিংবদন্তী তুল্য। এই যুবক আপন সাহস আর বীরত্বের কারণে একসময় পাঁচটি রাজ্যের রাজা হলেন। ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে এই রাজ্য পাঁচটি নিয়ে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য শাসন করেন যিনি, রাজ্যটি তখন গৌড় নামে পরিচিত ছিলো। আজ থেকে এক সহস্র চারশত বার বছর আগের কথা অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিঃ সালে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক তাহার সিংহাসন আরোহনের দিন পুরানো শকাব্দ থেকে নতুন বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন।

অনেক ইতিহাস বিদ বলে থাকেন গৌড় এবং বঙ্গ দুটো পৃথক রাজ্য ছিলো। কৌনজের রাজপুত্র হর্ষবর্ধন ৬০৬ সালে বহু শাসন করেন এবং তিনি হর্ষাব্দ নামে একটি অব্দের সৃষ্টি করেন। যা হোক, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) ৯০৩ হিজরি সনে, বঙ্গাব্দকে নতুন মাত্রা দেন হিজরী চন্দ্রবর্ষকে সৌরবৎসর বঙ্গাব্দের সাথে সমন্বয় করে নতুন বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তখন বাংলাসন, গণনা অগ্রাহয়ন মাস থেকে শুরু হতো। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ১২ বৎসর বয়সে ১৫৫৬ খ্রিঃ সাল মোতাবেক হিজরী ৯৬৩ সনে দিলীর সিংহাসনে আরোহন করেন।

ক্ষমতা গ্রহণের ২০ বৎসর পর ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই, রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন আফগান শাসক দাউদখান করবানীকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল ১৫৭৬ সালে অর্থাৎ ৯৮৩ হিজরী সনে বঙ্গাব্দকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে প্রচলিত বিভিন্ন বর্ষপঞ্জির সাথে সমন্বয় করে বৈশাখ মাসকে বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে ধরে নিয়ে চন্দ্রবর্ষ ও

সৌরবর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন পুর্বক নতুন বাংলা সন শুরু করার জন্যে মোগল কর্মচারী আতাউলাহ্ খান ফায়েজীকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সেই থেকে বর্তমান বাংলা বর্ষপঞ্জির শুরু। বাংলা সালের যাত্রা শুরু ১৪১৩ বৎসর আগে। বর্তমান বাংলা নববর্ষের যাত্রা শুরু ৪৩০ বৎসর পুর্বে মাটিরপাত্রে রান্না করা ভাত মাটির সানকিতে ইলিশ মাছ আর বেগুন ভাজি সহযোগে একত্রে বসে খাওয়ার শুরু হয়েছে চলিশ বছর পুর্বে। অব্দের শুরু, উন্নয়ন, সংস্কার আর নববর্ষ বরণ উৎসব বিয়ষগুলো আজ একই গ্রন্থিতে গাথাঁ এখানেই বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য বর্ষপঞ্জি তথা জাতিসমুহের নববর্ষের সাথে বাঙালী জাতির নববর্ষের পার্থক্য।

আজই একই গ্রন্থিতে গাথাঁ বাংলার বিভিন্ন অংশ কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও একত্রিত, কখনও স্বাধীন, কখনও পরাধীন থেকেছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ১৩৬তম দেশ। এই স্বাধীন স্বদেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পুর্বে।

বাংলার নববর্ষ উৎসব

পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ বাঙালী জাতির একটা সার্বজনীন জাতীয় উৎসব। উৎসবের দিনে আমরা নিজের আনন্দে বহুর সঙ্গে মিলিত হই। নববর্ষের বিশেষত্বকে আশ্রয় করে আমরা বিচিত্র সব উৎসবের আয়োজন করি। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় , জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের যোগ বেশি, সংকীর্ণ সীমা উত্তীর্ণ হয়ে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করছে নববর্ষ। নববর্ষ বর্তমানে একটি জাতীয় উৎসব। এ উৎসব জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর জাতীয় মহোৎসব। নতুন বিশেষ রঙের শাড়ি পাঞ্জাবী পরিহিত তরুন-তরুনীরা সারাটি দিন মাতিয়ে রাখে দারুন প্রাণময়তা দিয়ে। উৎসবের আমেজ বজায় থাকে রাত অবদি।

অখন্ড মহাকাল বয়ে চলেছে অনাদিকাল থেকে। এই অনাদিকালকেও মানুষ খন্ডিত করে পুনরায় আরম্ভের পক্ষপাতী। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা নববর্ষের ঘষামাজা হয়েছে বেশ কয়েকবার। পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই নিজস্ব অব্দ বা বর্ষ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের নিজস্ব অব্দ হলো ‘বঙ্গাব্দ’ বা বাংলা সন। আমরা জেনেছি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বর্ষ আরম্ভ হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। অগ্রহায়ণ মাসের নাম ছিল মার্গশীর্ষ মাস। অশিক্ষিত জনসাধারণ তখনও চন্দ্রসুর্যের গতি দেখে বর্ষ গণনা করতে শিখেনি। তাই প্রাকৃতিক স্বভাবের লক্ষণ দেখে তারা বর্ষ গণনা করতো।

অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, হায়ন অর্থাৎ ব্রীহি বা ধান জন্মায় সে সময় সেটা অগ্রহায়ণ। রাজস্ব আদায় ও ঋণ পরিশোধের এটাই ছিল যথার্থ সময়। কারণ এ সময়ে কৃষকরা ফসল তুলতেন বাংলার খাজনা বাংলাতেই থাকতো তাই রাজার খাজনা অগ্রাহয়ন মাসেই জমা করা হতো । এটাকে ফসলী সালও বলা হতো। কিন্তু কালের গতি পরিবর্তনশীল । বাংলা যখন স্বাধীনতা হারালো, তখন অগ্রহায়ণের পরিবর্তে বৈশাখ থেকে বর্ষ গণনা শুরু হলো। বিশাল নক্ষত্রযুক্ত পুর্নিমার নাম বৈশাখী। যে মাসে এ বৈশাখী হয় তার নাম হয় বৈশাখ। বৈশাখ মাস ভিন্ন নামে ভারত বর্ষের অন্য অনেক বর্ষপঞ্জীর প্রথম মাস।

বাংলা সন প্রচলনের পিছনে দুজন মুসলমান সম্রাটের নাম জড়িত। ‘সন’ শব্দটি আরবী। সাধারণের ধারণা সে সময়ে প্রচলিত সৌর বৎসর ও আরব দেশের হিজরী সনের অর্থাৎ চান্দ্রবৎসরের সমন্বয়ে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের প্রচেষ্টায় বর্তমান বাংলা সন চালু হয়। হোসেন শাহের রাজত্ব আরম্ভ হয় ৯০৩ হিজরী অর্থাৎ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক সে সময়ে অথবা এর কিছুকাল পরে বর্তমান বাংলা সনের সুচনা হয়। বর্তমান বাংলা নববর্ষের প্রবর্তক হিসেবে অনেকে সম্রাট আকবরের নাম উলেখ করেন। তাঁদের মতে, হিজরী সন থেকে দশদিন কম ধরে আকবরের রাজস্ব বিভাগের প্রধান মন্ত্রী টোডরমল, রাজকর্মচারী আতাউলাহ্ খান ফায়েজীকে দিয়ে নববর্ষের সুচনা করেন।

বাঙালী জাতিসত্তার গোড়াপত্তন ঘটে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে। পরবর্তীকালে বাংলার মুসলমান শাসকদের আমলে বাঙালীদের ভাব ও সাংস্কৃতিক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন বাংলা ৯৬৩ সনে। তখন ৯৪৫ বাংলা সনের লিখিত হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছিল। আকবরের বহু পূর্ব থেকেই বাংলা সন প্রচলিত ছিল। হিসাব করে দেখা গেছে ৯১০ হিজরী সনের সঙ্গে বাংলা সনের মিল হয়। গণনায় গড়পড়তা ৫/৬ দিন বেড়ে যায় বলে ৯০৩ হিজরী সনে বাংলা সনের আরম্ভ ধরতে হয়। তাই প্রচলিত মত হলো সুলতান হোসেন শাহ্ই বর্তমানে বাংলা সনের স্রষ্টা। বাংলা সন সুলতান হোসেন শাহের আমলে প্রথম প্রচলিত হলেও আকবরের আমলেই এটা একটা সর্বভারতীয় সনসমুহের অন্যতম সন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলা নববর্ষ। বাঙালীর জীবনের নবচেতনার আলোকে নতুন জীবনের অবগাহনের দিন। আবহমানকাল ধরে এ দিন বাঙালীর জীবনে নতুন সম্ভাবনার উৎসবের দীপালী জ্বালিয়ে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। পহেলা বৈশাখের সঙ্গে মুছে যায় যত সব জীর্ণ পুরাতন। চিরনতুনকে বরণ করে নেয়ার আর্তি আকুল হয়ে ওঠে। পহেলা বৈশাখ তাই বাঙালী জীবনে নবউন্মেষের দিন অতীতকে মুছে ফেলার দিন। বিগত বছরের সকল দুঃখবেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ, আর গান দিয়ে ঢেকে দেয়ার দিন। পহেলা বৈশাখ উৎসবের দিন। নবতরঙ্গে মঙ্গলের ঘন্টাধ্বনি প্রত্যন্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে দেবার দিন।

৫৯৩ খ্রিষ্টীয় সালে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক যে অব্দের শুরু করেছিলেন সৌরবর্ষ হিসেবে, ১৪৯৮ খ্রীয় সালে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ তাকে চন্দ্র বর্ষের সাথে সমন্বয় করেন। ১৫৭৬ সনে অর্থাৎ মাত্র ৩৮ বৎসর পরে সম্রাট আকবর সনটিকে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে রাজকীয় বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তর করেন। এই হাল আমলে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাসনকে এক বছর পিছিয়ে দেন। অন্য বাঙালীদের যখন বিদায়ী বর্ষের শেষ দিনে অবস্থান করবেন তখন বাংলাদেশের বাঙালীরা নববর্ষ উদ্‌যাপনে ব্যস্ত থাকবে।

যদিও বছরের প্রথম দিনটি প্রতিদিনের মতই একটি দিন। কিন্তু তবু কোথায় যেন এর মধ্যে একটা অপূর্বতা রয়েছে। মানুষ অতীত বছরের ব্যর্থতা ও গানি ভুলে গিয়ে নতুন বছরে আরও ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে চায়। তাই প্রতিটি বাঙালী এই দিনটিকে উৎসবমুখর করে তোলে। সরল বাঙালীরা বিশ্বাস করে বছরের প্রথম দিনটি যেমন যাবে সারা বছরই তেমন যাবে। তাই এই দিনে মানুষ ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ব্যবহার করে। আনন্দে কাটায় দিনটি প্রার্থনা করে যেন গোটা বছরটাই যেন আনন্দে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পহেলা বৈশাখ বিভিন্নভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পলী অঞ্চলে নববর্ষের শুরুতে মেলা বসে। শিশুরা খেলনা কিনে আনে, নাগরদোলায় দোলে, বিচিত্র আনন্দানুষ্ঠানে যেতে ওঠে। বড়োরা সম্বৎসরের জন্য মাটির বাসন, নানারকমের রবিশস্য, বেতের বাঁশের ডালা-কুলা, লোহার ও কাঠের নানা ব্যবহার্য উপকরণ কিনে রাখে।

পহেলা বৈশাখে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ‘হালখাতা’ উৎসব। বিচিত্র সুন্দর উপকরণে দোকানঘর সাজিয়ে ‘হালখাতা মহরৎ করা হয়। জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। নববর্ষের পুন্যদিনে গৃহস্থরাও বহুবিধ অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। কোথাও কোথাও হাল-চালনা উৎসব হয় এ দিনেই। নববর্ষের দিন চট্টগ্রাম জেলায় ‘আমানী’ খাওয়া, বলীখেলা, ঢাকা ও কুমিলা জেলায় গরুরদৌড়, রাজশাহী ও মালদহতে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং সারা বৈশাখ মাস ধরেই চলতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানটি বাঙালীর একটি জাতীয় উৎসব। শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালীর এতে সমান অধিকার। এটা শংকর-বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এখানে একটা প্রণীধানযোগ্য বাংলাদেশ তথা বঙ্গোপসাগর থেকে হিমালয় অব্দি বিশাল বদ্বীপের লিখিত ইতিহাস খুব পুরানো নয়। ত্রয়োদশ শতকের পুর্বে এই ভুভাগের প্রকৃত ইতিহাস খুব পুরানো নয়। ত্রয়োদশ শতকের পুর্বে এই ভুভাগের প্রকৃত ইতিহাস অনুমান নির্ভর। গ্রীকরা সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ইতিহাস লিপিবন্ধ করেছিলো। বাংলার ইতিহাসের সন তারিখ এক ইতিহাসবিদের সাথে অন্য ইতিহাসবিদের সাথে মেলে না। তুর্কীদের আগমনের পুর্বে জ্যোতিবিদ্যা বর্ষপঞ্জি ঠিকুজি সম্পর্কে পন্ডিতরা চুলচেরা চর্চা করলেও তখন তিথিবারে সবার দৃষ্টি ছিলো নিবন্ধ।

সঠিক সন তারিখ নির্ধারণে পন্ডিতদের কোন উৎসাহ ছিলো না। কৃত্তিবাস আদিত্যবার। স্ত্রী পঞ্চমী পুন্য মাঘ মাসে জন্মে ছিলেন- নির্দিষ্ট কোন সন তারিখ নেই । সঠিক জন্ম তারিখ বের করা কষ্ট করা সন আরবী শব্দ এর বহুবচন তাওয়ারিখ অর্থাৎ ইতিহাস। তাই দেখা যায় আরব দেশীয় শাসক বা মুসলিম শাসকরা বাংলা শাসন করার সময়ই বিজ্ঞান ভিত্তিক অব্দের প্রচলন হয়েছে। ৫৯৩ সালে প্রবর্তিত বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ) ১৫৭৬ সালে এসে বঙ্গাসন হয়েছে। ২০০৬ সনে বাংলা নববর্ষ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ। নববর্ষ সবার জন্যে শুভ হোক।

বর্ষবরণ

এ.এফ.এম ফতেউল বারী রাজা

প্রভাতে রক্তিম সুর্যোদয়ের সোনালী রশ্মির ছটা পূর্বে দিগন্তের তিমিরে জেগে ওঠার সাথে সাথে এদেশের আদি আধিবাসী এবং বাঙ্গালীদের ‘শুভ নববর্ষ’ সম্ভাষণ আর কোলাকুলি দিয়ে শুরু হয় বাংলা নববর্ষের জন্ম মুহূর্ত পহেলা বৈশাখের।

চারশত বছর পূর্বে মুঘন সম্রাট মহামতি আকবর ফসল তোলার সময় খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে হিজরী সনের সঙ্গে মিল রেখে বঙ্গাব্দ গণনার রীতি প্রচলন করেছিলেন যা কাল পরিক্রমায় জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাঙ্গালীর প্রাণের হিলোল এবং অনাবিল আনন্দে অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন মহামিলনের মহোৎসবে পরিণত হয়েছে পহেলা বৈশাখ। যে উৎসবের জোয়ারের সাদর সম্ভাষণ জানাতে মেতে উঠে বাঙ্গালীর প্রাণ। ছন্দে ছন্দে কত আনন্দে কবি গুরুর গানে গানে,

“এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা।”

আমাদের বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকায় ১৯৬৭ সালে ১৩৭২ বঙ্গাব্দে সোহ্‌রাওয়ার্দী (রমনা) উদ্যানে পাকুর বৃক্ষতলে শতায়ু প্রাঙ্গণে ছায়ানটের প্রভাতী গানের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিলো বর্ষবরণ উৎসব। মাত্র সাড়ে ছয়শত গন্ডিবন্ধ শ্রোতামন্ডলীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত নিরাভরণ পরিবেশে এ উৎসবের যাত্রা শুরু হলেও মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য পরিস্থিতির কারণ ব্যতীত কখনও এ অনুষ্ঠান বন্ধ থাকেনি। তবে ১৪০৮ বঙ্গাব্দে অপশক্তির অশুভ কালো হস্তের বোমা হামলায় তাৎক্ষণিক দশ জনের অকাল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এর পরের বছরও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থেমে থাকেনি। অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয়েছিল চারুকলার মঙ্গল শোভা যাত্রা। যাতে শোভা পেয়েছিল বিরাটকায় পাখি, ঘোড়া, বাঘ, হাতী, ড্রাগন সহ বিভিন্ন মুখোশ। গেল ২০০২ ইং সালে ইঙ্গ-মার্কিনদের ইরাকের উপর নির্লজ্জ বর্বরোচিত ঘৃণ্য হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে অনুষ্ঠানে গান প্রধান্য পেয়েছে।

আগ্রাসন এবং হামলার বিরুদ্ধে মঙ্গল শোভাযাত্রায় নরখাদক বুশ এবং তার পদলোহী কুত্তা বেয়ারের উপর ব্যঙ্গাত্বক চিত্রে বিভিন্ন পোস্টার ফেস্টুন সঙ্গত কারণেই স্থান পেয়েছিল। যা চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলা থেকে দোয়েল চত্বর, মৎস ভবন ও শিশু পার্ক প্রদিক্ষণ হয়ে পুনরায় বকুলতলায় এসে শেষ হয়েছিল। জানা যায়, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজক ছাত্র-শিক্ষকরা ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে মাটির টেপা পুতুল সহ আমেরিকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজের প্রতীক “স্ট্যাচু অব লিবার্টি” জাতীয় মনুমেন্টের বিশালাকায় দানবাকৃত এক ব্যঙ্গাত্বক প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করেছেন। মূর্তির গা জড়ানো ছিলো কুৎসিত কালো আবরণে, নীচে লেখা ছিলো ‘সাম্রাজ্যবাদী ন্যায় বিচার” এক হাতে ছিল মশালের পরিবর্তে বিচারের প্রতীক নিক্তি। নিক্তির ডান পালায় প্রতীকি বিশ্ব, বাম পালায় টাকা- পয়সা।

পৃথিবীর চেয়েও টাকার ওজন বেশী দেখানো হয়েছে। অন্য হাতে পুস্তকের পরিবর্তে তুলে দেয়া হয়েছিল হামলাকারী সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক যুদ্ধ বিমান। এই বিশালাকার মূর্তিটি শোভাযাত্রায় বহন না করে সাহাবাগের মোড়ে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। যাতে করে ঐ মূর্তির কুৎসিত কালিমায় জড়ানো রূপ নববর্ষের আনন্দঘন পরিবেশকে মুহূর্তের জন্য হলেও বিষাদগ্রস্ত করে এবং মার্কিনীদের প্রতি অনন্ত ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। এ বছর মঙ্গাল শোভাযাত্রায় আমাদের দেশে সন্ত্রাস ও বোমা হামলায় নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিবাদের বিভিন্ন চিত্র, পোস্টার ও ফেস্টুন থাকবে বলে আশা করি। তাছাড়া ইসলামী লেবাসে বৃহদাকায় দানব সদৃশ নরখাদকের মূর্তি স্থান পেতে পারে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান প্রতি বছর ন্যায় এবারও পাকুর বৃক্ষতলে তথা রমানার বটমূলে শতায়ু অঞ্জান থেকে অস্থাচল সহ পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠবে। ছায়ানটের তরুণী শিল্পীরা আসবে মুখে আলপনা, কপালে টিপ, কাঁকন, বেলী ও গাঁদা ফুলের অলংকারে সজ্জিত হয়ে, লাল পাড়ের বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পড়ে। সেই সংগে তরুণ শিল্পীরাও সমবেত হবে ঐতিহ্যবাহী পাজামা, পাঞ্জাবী পড়ে। নানা বর্ণের নানা পোষাকে শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা ও তার সংগে অজস্র মানুষ যোগ দেবে সেই সাথে।

ভোর ছয়টায় শুরু হবে সমবেত তবলার বাদন একটানা ১৫ মিনিট। এরপর একসংগে আরও ১৫ মিনিট চলবে বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের সুর। উৎসবের জোয়ারে এভাবে গা ভাসিয়ে চৈত্র শেষে শুকনো পাতার মতো বিগত দিন গুলোর সব ব্যার্থতা, সব ব্যথা, সব গানী ঝেড়ে ফেলে, ধুয়ে মুছে বৈশাখকে বরণ করা হবে নতুন স্বপ্ন আশা নিয়ে। উদ্যানের ভিতরে খুব ভোরে থেকেই অপ্যায়িত করা হয় নানা ধরনের দেশী খাবারের মাধ্যমে। এসময় চলবে মাটির সানকিতে পান্তাভাত, ইলিশ ভাজা, চ্যাপা শুটকি, টাকি মাছের ভর্তা, বেগুন ভর্তা, আলু ভর্তা, ডাল ভর্তা, সরিষা ভর্তা, কাঁচালংকা, শুকনো পোড়া মরিচ খাওয়ার এক মহা প্রতিযোগীতা।

যে কখনোও পান্তা ভাত খাননি, সেও এই দিনটিতে এহেন ললুপ রসনার সাধ গ্রহণে সামিল হতে ভুল করবেন না।তাছাড়া দেশী চিতই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, ছাউন্না পিঠা, নারিকেলের সন্দেশ, চিড়ার লাড্ডু, মুড়ির মোয়া, মঠা মিঠাই, হাওয়াই মিঠাই, মুড়ি মুড়কি, তিলের খাজা, বাতাসা, কদমা, মিহি দানা, চানাচুর, বুট, চিনা বাদাম ইত্যাদির পসরা বসবে। উদ্যানের মুল ফটকের পাশেই বসে এই মেলা। ৬.৩০ মিঃ থেকে ২ ঘন্টাব্যাপী শুরু হবে ছায়ানটের শিল্পীদের কণ্ঠে প্রভাতী অনুষ্ঠানে দেশের গান। বাঙ্গালীর সাথে বাংলা গানের পরিচয় হবে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যেমন

''উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই''। আবার
''দুর্গম গিরী কান্তার মরু দুস্তর পারাবার ওহে
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুশিয়ার''।

যার শেষ হবে রণ ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে। এরপর চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে বের হবে মঙ্গাল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা শেষে চারুকলার বকুলতলায় বসবে ঋষিজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খ্যাতনামা বাউল শিল্পীরাও গান করবেন। তাছাড়া তরুণ তরুণীরা হাত তালি আর তুড়ি দিয়ে নেচে নেচে গাইবে গান। যেমন -
''সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী''

তাদের মুখে আঁকা থাকবে নানা রংয়ের উলকি। চারুকলার ছেলে মেয়েরা সেদিন বহিরাগতেদের মুখেও উলকি এঁকে দেবেন। বাংলা একাডেমী ও নজরুল একাডেমী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসুচির মাধ্যামে দিনটি মহা আরম্বে পালন করবে। আমাদের চাঁদপুরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোও বর্ষবরণ মহাসমারোহে বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে পালন করে থাকে। তবে জানা গেছে চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন সংগীত নিকেতন ছায়া নটের ভাবধারায় বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করবে।

নববর্ষের শুভাগমনের প্রারম্ভে সংগঠনের শিল্পীরা শহরের প্রাণ কেন্দ্রের বিশেষ স্থানে আলপনা আঁকবে। সকাল ৬টা থেকে শিল্পকলা মঞ্চে ছায়ানটের কায়দায় মুল অনুষ্ঠান শুরু হবে।

৬টা ৩০ মিনিটের সময় প্রভাতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরুহবে সংগীত পরিবেশনা। সংগীতানুষ্ঠান শেষে শিল্প কলা ভবন প্রঙ্গাণ থেকে বেরুবে মঙ্গাল শোভা যাত্রা। শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর শিল্প কলা ভবন প্রাঙ্গানে এসে এর সমাপ্তি হবে। তারপর সবাই মিষ্টি মুখ করবে। এরপর থাকবে চিত্র প্রদর্শনী এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা। বিকেল ৩টা থেকে শুরু হবে আবৃতি এবং আলোচনা। আলোচনা শেষে হবে পুরস্কার বিতরণ। তারপর নৃত্যানুষ্ঠান, যন্ত্র সংগীত এবং সংগীতানুষ্ঠান। যা মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে।

বর্ষবরণের হৃদয় উজাড় করা প্রাণ মাতানো অনন্য আয়োজন বৈশাখী মেলা। যা সকাল থেকে জমে উঠে এবং সন্ধ্যা নাগাদ চলে। এই মেলা কোথাও একদিন, তিনদিন, একসপ্তাহ, পনের দিন এমনকি মাসাবধিও চলে। গ্রাম-গঞ্জ-শহর দেশের সর্বত্র হয়ে থাকে এই মেলা। দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হস্ত শিল্পীদের সু-নিপুন হস্তের শিল্প নৈপুণ্যে মনোরম শিল্পকর্ম বা দ্রব্য সামগ্রীর মহাসমারোহ ঘটে এই মেলায়। যেমন - বিভিন্ন প্রকার মাটির, কাঁঠের, সোলার পুতুল, জীব-জানোয়ার, কতরকম তালের পাখা, বাঁশের বাঁশি, পাটজাত দ্রব্য, সোলা কাগজ এবং কাপড়ের তৈরী নানা রঙ্গের ফুল,

বিচিত্র ধরনের খেলনা, ছোট ছোট, খেলার হাড়ি-পাতিল, আসবাবপত্র, মাটির বিবিধ মৌসুমী ফল, পয়সা রাখার সাজ করা মাটির ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীর সরা, ঢোলক, ডুগডুগি,অদ্ভুত সকল প্রাণীর মুখোশ ইত্যাদি প্রধান। এ ছাড়া মেলায় বিভিন্ন প্রকার কাঁচের চুড়ি, ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ার শাড়ি যে কোন মানুষের চোখ ধাঁদিয়ে তুলবে। তাই এগুলো মেলার দৃষ্টিকাড়া, চিত্ত হরনকারী, মনলোভা বস্তু বা মুল বিক্রয় পণ্য। তাই বৈশাখী মেলা দেশজ কৃষ্টি হিসাবে গণ্য হতে বাধ্য। পুতুল নাচ, বানর নাচ, সাপের খেলা, মোরগের লড়াই, বলির খেলা, নাগর দোলা বা রাধা চক্কর মেলাকে সার্বক্ষণিক মাতিয়ে রাখে।

পহেলা বৈশাখ চাষীদের বীজ বপনের পস্তুতির দিন। শুভ হালখাতা অনুষ্ঠান উদযাপনের দিন। বিগত দিনের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ পুর্বক নুতন ঋণ গ্রহণে উদ্ধুদ্ধ করার দিন। ঘর ধুয়ে মুছে সাজিয়ে হালখাতার ঐতিহ্য স্বরূপ মিষ্টি মুখ করে এক উৎসবের আমেজ তৈরী করার দিন। ঋণ গ্রহীতাকে আমন্ত্রন জানানোর দিন। নববর্ষের কার্ড পাঠিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে শুভ কামনা, ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা জানানো বা আদান প্রদানের দিন। তাই
পহেলা বৈশাখ তথা ১৪১৩ বঙ্গাব্দে -

নববর্ষের আর্শীবাদ

আজি আর্শীবাদ নববর্ষের
প্রথম প্রহরের শুভক্ষণে
শান্তির অমীয়ধারা বহুক
অনন্তকাল ধরে সকলের
প্রাণ বৃক্ষের হৃদয় মুলে।
প্রসন্নচিত্তে প্রফুল মনে
আনন্দদোলায় দোল খাক
সুখানুভুতিতে অবিভুত হয়ে।

(১)

বাংলা নববর্ষের দর্শণও ১লা বৈশাখ উৎসব

পীযুষ কান্তিরায় চৌধুরী

বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। প্রিয় মাতৃভুমি, আমরা সবাই বাঙ্গালী। আমাদের আছে সংস্কৃতি ঐতিহ্য। একটি নিজস্ব ভাষা বাংলাভাষা। আমাদের এই বংলাদেশ প্রাচীনকালে রাজনৈতিক বিচারে একধিকবার পরিবর্তন হয়েছে। গৌড় থেকে বঙ্গা এবং তারপর পুর্ব বঙ্গা অঞ্চলটিই পুর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। তদুপরি বলা যায়, প্রাচীনকালে অবিভক্ত বাংলাদেশে নানা বর্ণ, গোত্রের অধিবাসীর জীবন যাত্রা ও ধ্যানধারনার সংমিশ্রনে সংস্কৃতির একটি রূপ গড়ে উঠে। একেই বলা হয়েছে বাঙালী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির তিনটি প্রধান লক্ষণ চিহ্নিত করা হয়েছে-

১। জীবন যাত্রায় বাহুল্যহীনতা
২। জাতি ও সম্প্রদায় ভেদে বিভক্ত
৩। আধ্যাতিকতায় বিশ্বাস পরজন্মে এবং একই সঙ্গো কর্ম ফলেও।

জনবৈশিষ্ট্যের বিচারে আর্য ও অনার্য শ্রেণীর মানুষের বসবাস ছিল এ অঞ্চলে। এরা ধর্মে সবাই সনাতন। বাংলার অনার্য জনগোষ্ঠির সঙ্গো সংস্কৃতির মৌল চেতনায় আর্যদের বিরোধ ছিল স্পষ্ট। সংখ্যায় অনার্যরা অধিক হলেও আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে এদের ওপর পড়ে। ধীরে ধীরে এর সহনীয় রূপ, এই শ্রেণীর নিজেদের জীবন যাত্রার আচার নিয়মে ভাবনা কল্পনায় প্রাচীনতর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো গ্রহন করে। লোক সংস্কৃতির মধ্যে এদের অংশ গ্রহন ও অধিকার ছিল যথেষ্ট এবং নিরঙ্কুশ। লোক সংস্কৃতিক এ লৌকিক উত্তরাধিকার পরবর্তী কালে বাংলা ও বাঙালীর বাংলার খাঁটি জিনিস হিসেবে গণ্য হয়। দ্বাদশ শতকের পুর্বে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে ধর্মীয় বিচারে বৌদ্ধ ও হিন্দু আচার-বিশ্বাস মুখ্য। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলার মুসলিম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাঙালী সংস্কৃতিতে নতুন মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

পালযুগ (৭০০-১১০০) সে যুগ (১১০০-১২০০) অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের শাসনামলে সামাজিক উচ্চ (এলিট) শ্রেণীর সঙ্গো অন্তজ মানুষের সংযোগ সাধিত হতে পারেনি। জাত ও সম্প্রদায় বিভেদে সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিকে বিচ্ছিন্ন করে। ইখতিয়ার উদ্দিনের বাংলার সিংহাসন দখলের পর প্রায় দেড়শ বছর বাংলায় ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময় ইসলাম ধর্মীয় বিশেষ করে পারসী ও আরবীয় সংস্কৃতির কিছু উপদান বাংলার সংস্কৃতিতে স্থান জুড়ে নেয়। ১২০০ থেকে ১৭৫৭ সালের মধ্যবর্তী সময় মুসলিম শাসন কালে বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গো পারস্য ও আরবের ভাষাও জীবন কালে বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গো পারস্য ও আরবের ভাষা ও জীবন চর্চ্চার মিথস্ক্রিয়া ঘটে। ১৮৩৫ সাল অবধি রাজভাষা হিসেবে পারসিয় ভাষা ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে ধর্মে মুসলিম হওয়ায় বাংলার এক বিরাট জনগোষ্ঠির জাত পাতের নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেল।

আরবীয় ইসলাম সমাজে গোত্রভেদের অস্তিত্ব থাকলেও বহির্বিশ্বে প্রচারিত ইসলামে গোত্র বা সম্প্রদায়ভেদ ছিলনা। সে কারনে বাঙালী সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও নবাগত ইসলাম ধর্মীয় উপদানের সংমিশ্রণে বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়। এ সময় শ্রী চৈতন্যদেব ও তার পরিষদ বর্গের নাম এ প্রসঙ্গো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদের মধ্যে শ্রী অতিশ দীপঙ্করের নাম স্মরণ করতে হয়। উনিশশতকে আলীগড় আন্দোলনরে ফলে বাঙ্গালীদে মুসলিমদের মধ্যে জাতি চিন্তায় অধীক সজাগ ছিল।বঙালীর ভাষা হিসেবে বাংলা কবিতাও গদ্যে সুনিদ্দিষ্ট কাঠামো অর্জন করে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদ এ বাঙালী সংস্কৃতির যে রূপ ও কাঠামোর পরিচয়

মিলে সেই ধারা অব্যাহত থেকেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব নাথ-পুঁথি সাহিত্যের সম্মিলনে বাঙালী সংস্কৃতির সাহিত্যিক নবরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে।
বাঙালীর সাংস্কৃতিক দৃঢ়তা ও ঐক্যবদ্ধতা দুরদর্শী ব্রিটিশের দৃষ্টি এড়ায়নি বলেই ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ আইন করা হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ আইন পাশ করলেও ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করে কাযৃত বাঙালী জাতীয় ওপর প্রতিশোধ গ্রহন করে ইংরেজরা।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আজকের বাংলাদেশ চার নামে পরিচয় পায়। বাংলা পুর্ববাংলা, পুর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পুর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের ভাষা সংস্কৃতি স্তব্দ করে দেবার জন্য বৈসম্য আচরনে একতাবন্ধ বাঙালীরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি ফিরে পায়। একক বাংলাদেশ রাষ্ট্র। এখানে হিন্দু বৌদ্ধ-মুসলিম খ্রিষ্টান উপজাতীর এক মেল বন্ধন। ঈদ, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধ পুর্নিমা, বড়দিন ধর্মীয় উৎসব যথাযথ সময়ে পালিত হয়। সকল বাঙালীর মিলনের একটি উৎসব তা হলো বর্ষবরণ।

বাংলা বর্ষকে বরণ করে নেয়া উৎসবটি ফসলী উৎসব বলা যায়। ইংরেজ শাসন কালে জমিদারী প্রথা চালু হলে জমিদারগণ প্রজাদের থেকে মাঠে ফসলের খাজনা আদায় করতে বছরে একটি দিন ধার্য্য করে ছিলেন বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। পূর্বে এ ফসলি খাজনা হিসেব ছিল অগ্রহায়ণ মাসে। বাংলা সনের বারটি মাস, ছয়টি ঋতু, ৩৬৫ দিন হিসেব করে এই বাংলা বৈশাখ মাসকে উপযুক্ত সময় ধার্য্য করে পুণ্যাহ উৎসব অর্থাৎ পুণ্য কাজ মাঙ্গালীক অনুষ্ঠান জমিদার-মহাজনের বাড়িতেই মিষ্টি মুখ করিয়ে খাজনা আদায় করা হত। নতুন খাতায় কড়ায় গন্ডায় হিসাব নিকাশ লিপিবন্ধ করা হত। এতে বছরান্তে প্রজা ও রাজা অর্থ লেন-দেনে আনন্দ উপভোগ করতো, খাজনা দেনায় অপারগতা প্রকাশ করলে জমি হাত ছাড়া হত। নির্যাতন সহ্য করতে হত। ভিটে মাটি বিক্রি করে দেনা শোধও করতে হত।

নববর্ষের ব্যবসায়িরা হালখাতা নিয়ে বসতো। আজকাল অতীতের মত আনন্দ উৎসবে হালখাতা ব্যবসায়ীরা খোলে না। সারা বছরই দেনা পাওনার হিসাব চলে। এই নববর্ষকে ঘিড়ে বাংলার গ্রাম গঞ্জে মেলা বসে পুতুল নাচ, নাগড়দোলা, ঘুড়ি উড়ানো, সার্কস, যাত্রা, জারিগান, দোকানীরা হরেক রকম খেলনা নিয়ে বসে যায়। মনোহারী চুড়ি। আলতা, ফিতা, আরো কত কি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যেন বেশী আনন্দ। বাংলার যত শিল্প সংস্কৃতি আছে তা যেন এই বৈশাখী মেলাতেই দেখা যায়। গানে গানে মুখরিত নববর্ষের দিনটি হয়ে উঠে প্রানবন্ত। প্রান্তাভাত আর শুটকী ভত্তা, ইলিশ মাছের ভাজি মন কেড়ে নেয়।

বাংলার বর্ষ বরণ করতে গিয়ে ছয় ঋতুকে বরণ করতে হবেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ - হেমন্ত- শীত ও বসন্ত। এদেরকে নিয়েই শ্যামল বাংলার রূপ ভালবাসার চুম্বন। এই ছয় ঋতুতে বার মাস সব ক'টাই মধুমাস। কেউ বলতে চায় অগ্রহায়নে, ভাদ্রে, কেউ বলে চৈত্রে আমরা বর্ষবরণ করিনা কেন? কি করে সম্ভব তা হয়না। জ্যোতি বিজ্ঞানীরা বহু গবেষনা করেছেন তার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় তিনশত পয়ষট্টি দিন, পাঁচ ঘন্টা, আটচল্লিশ মিনিট আর ছয় সেকেন্ডে আমাদের মনোরম পৃথিবী সম্পুর্ণ ঘুরে আসে সুর্যের চারিদিকে। সুর্য্য তো অগ্নিতেজের আকর।

সুর্য বিনে অন্যকে আর নেবে প্রকৃতির নিয়ম বন্ধনকে। সেই সৌরনীতির ফলেই দ্বাদশ রাশির প্রথম রাশি মেষের প্রথম নক্ষত্র বিশাখা পুর্ণ চাঁদের আলো নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। আর সেই আলোকিত লালিমায় বিশাখার নামে বাংলার প্রথম মাস, নাম তার বৈশাখ। তাই বৈশাখ দিয়ে বাঙলার নবজন্ম। হোক রুদ্র, হোক প্রচন্ড তবু এই বৈশাখ বাংলার প্রথম বৈশাখ। বৈশাখের দাবদাহ নিয়ে মধুমাসের অমৃত ফল দিয়ে নববর্ষ শুরু। এই রুদ্র,এই তুফান শেষে আসবে প্লাবিত বর্ষন। তারপর আসবে শরতের নীল আকাশ, তারপর স্নিগ্ধ হেমন্ত। তারপর শীত আর শীতের পরে প্রজাপতির নাচন নিয়ে বসন্ত। বিলাপ দিয়ে শেষ হবে বাংলার বছরের হিসাব। আসবে আবার রুদ্র বৈশাখ। এইতো চক্র, এইতো লীলাময় খেলা আমাদের বাংলার।

যারা বাংলাকে চায়নি, বাংলা তাদেরও চায়না, ধুধু মরু ভুমির মধ্যে চলে যাক তার, বেদুইনের তাবুতে গিয়ে বাস করতে এত দ্বিধা কেন। তারা বুঝুক তখন, বাংলা কত মধুময়। আমতলা আর জামতলায় দোয়েল কোয়েলের সাথে বসবাস জীর্ন কুটিরেই আমার বসবাস। এখানেই রাত্রিকালে রাজকন্যা আসে। রাজকুমার বর

সেজে বসে আছে। এই ফুল শয্যার বাংলায় বেহুলা লক্ষিন্দর রূপবানের অলৌকিন কাহিনী অশ্রু আর আনন্দ। শিশিরের শব্দে কবির হৃদয় কেড়ে নেয়। বাউলের গানে মনকে দোলা দেয়। সুতরাং বাঙ্গালীর এই বাংলাদেশ নববর্ষে নবনব সাজে বরণ করবো। মেলার উৎসবে। মেতে উঠবে শিশু কিশোর- বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কানে পেতে শুনবে হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য গাঁথাগান আর গান ''এসো হে বৈশাখ এসো এসো.............. ''

২। 'বেশাখেরী মেলাতে চলো সবে যাই
নতুন নতুন সাজে মোরা সেজেছি আজ তাই....॥
এখনই সময় অতীতের শিল্প সংস্কৃতি ঐতিহ্য নব উদ্যমে মেলায় মেলায় ভরে দিয়ে নব প্রজন্মকে জানাই বাংলা নববর্ষ কি এবং ১লা বৈশাখ কেন?

---

(২)
পীযুষ কান্তি রায় চৌধুরী

ঘুটঘুটে অন্ধকারে মানুষ বাঁচতে পারে না। চাই তার আলো-ছায়া বাতাস, সবুজ প্রকৃতি, সমাজ ব্যবস্থা। এ সবের মুলে আমাদের সুর্য্য। পৃথিবী সুর্যের বিচ্চুত একটি গোলাকার পিন্ড। এই পিন্ডটি বহুদুরে ছিটকে গিয়ে সুর্য্যের চতুরদিকে ঘুড়ছে। উপরে উঠতে পারেনা নিচেও পড়ে না অর্থাৎ শুণ্য আকাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে সুয্যের চার দিকে মধ্যাকর্ষণ শক্তি তার মধ্যে সৃষ্টি কর্তা জল-বায়ু, গাছপালা- পাহাড় পর্ব্বত সৃষ্টি করে, মানুষও পশু পাখীর জীবন চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুর্য্য তো অগ্নিতেজের আকর। সুর্য্য বিনে অন্যকে আর নেবে প্রকৃতির নিয়ম বন্ধনকে। এই গ্রহ নক্ষত্রের সৌরজগতে সৌরনীতির ফলেই দ্বাদশ রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এর প্রথম রাশি মেষের আর প্রথম নক্ষত্র বিশাখা।

পুর্ণ চাঁদের আলো নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। সেই আলোকিত লালিমায় বিশাখার নামে বাংলার প্রথম মাস নাম তার বৈশাখ। তাই বৈশাখ দিয়েই বাংলা বছরের নবজন্ম। হোক রুদ্র, হোক প্রচন্ড, দাবদাহ নিয়ে মধুমাসের অমৃত ফল আম-কাঠাল-তরমুজ, বেথুন, মন্ডা, করমচা, আনারস, আতা, জাম, পেয়ালা আরো কত কি ফলের গন্ধে বাতাস মিষ্টিময়তায় ভরে তুলে। কৃষ্ণ চুড়ার ডালে ডালে আগুনের লাল রং ফুলে ফুলে ভরে যায়। বেলী, মাধবী, কনকচাঁপা, কাঠ গোলাপের গন্ধ ছড়ায় পাখীরা নব আনন্দে ডাকে কুহু-কুহু, কিচ্ কিচ্, কা-কা, বউ কথা কও ইত্যাদি আর বনের পশুরা আনন্দে ঘুড়ে বেড়ায়। কখনো রোদ- কখনো বৃষ্টি আবার কখনো মেঘ গর্জন বিজলী চকানোতে শঙ্কিত থাকে।

রুদ্র বৈশাখে ঝড় ঝঞ্জার তান্ডব, বিগত বছরের যত কালীমা ধুয়ে মুছ নিয়ে যায়। আসবে প্লাবিত বর্ষণ, নদী, নালা-খাল বিল এ ভরা যৌবন, মাঝি গাইবে আপন সুরে 'বৈঠা হাতে যাবো গঞ্জে, একটা পানের খিলি দে............।'' আসবে শরতের নীল আকাশ. তারপর স্নিগ্ধ হেমন্ত, তারপর শীত, কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে থাকবে বস্তি আর লঞ্চ রেল ষ্টেশনের দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি করুন দৃশ্য। আসবে প্রজাপতির নাচন নিয়ে বসন্ত। প্রেম-ভালবাসার হৃদয় কাড়া সংগীত কাব্যগ্রন্থ সৃষ্টি হবে। আবার বসন্তের বিদায় সুর বাজবে 'চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায়........।' শেষ হবে বাংলা বছরের হিসাব। আসবে আবার রুদ্র বৈশাখ। এইতো চক্র, এইতো লীলাময় খেলা বাংলার প্রকৃতির মাঝে।

পাঠকবৃন্দ, বাংলা বছরের প্রকৃতির হিসাব মিলানোর সাথে মানুষের ও একটি হিসাব নিকাশ জড়িত। বাঙালীর সাংস্কৃতির দৃঢ়তা ও ঐক্যবদ্ধতা দুরদশী বৃটিশদের দৃষ্টি এড়ায়নি বলেই ১৯০৫ সালে বঙ্গাভঙ্গা আইন করা হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গাভঙ্গা রদ আইন পাশ করলেও ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করে কার্যত বাঙালী জাতীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহন করে।

ইংরেজদের শাসনামলে জমিদার প্রথা চালু হলে জমিদার প্রথা চালু হলে জমিদারগণ প্রজাদের থেকে মাঠে ফসলের খাজনা আদায় করতে বছরে একটি দিন ধার্য্যকরে জ্যোতিষ গণনায় তা হল বৈশাখের প্রথম দিনটি। পুর্বে এ ফসলী খাজনার হিসাব ছিল অগ্রহায়ন মাসের (বাংলা সনের অষ্টম মাস)। জমিদার মহাজন এই

বৈশাখের প্রথম দিনটি মেনে নিয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের জীবন জীবিকার চাকা ঘুরিয়ে দেয়। নববর্ষের প্রথম দিনটিকে পুন্যাহ উৎসব অর্থাৎ পুন্য কাজ মাঙ্গলীক অনুষ্ঠান করে মিষ্টি মুখ করাতে থাকে আর খাজনার দেনা পাওনার হিসাব খুলে বসেন।

যাকে বলা হয় হালখাতার উৎসব। এই উৎসবে প্রজাদের মাঝে আনন্দের বিপরিতে দুঃখটাই বেশী দৃশ্যমান হত। কোন কোন জমিদার মহাজন বাৎসরিক খাজনা আদায় করতে না পারলে নির্যাতন করতো, জমি হাতছাড়া করে দিত। দেনার দায়ে কেউ আবার ভিটে মাটি বিক্রি করে দিত। আবার কোন কোন এলাকায় জনদরদি কৃষক দরদি জমিদারও ছিল তারা প্রজাদের দুঃখ কষ্ট স্বচোখে দেখে খাজনা মাফ করে দিতেন। সেই জাতীয় জমিদার ইংরেজদের নিকট দেনার দায়ে জমিদারী নিলামে উঠিয়ে দিতেন।

প্রজাকূল কিছুটা শান্তির সুবাতাস পেতো। এই হালখাতার উৎসবকে ঘিরে জমিদারদের বাড়ির নিকটে মেলা বসে যেত। বাঙালী সংস্কৃতির মেলা। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত এ মেলায় কেনাকাটা, আনন্দ উপভোগ করতো যাত্রা, সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, মাটির হাড়ি পাতিরের রঙবেরঙ দিয়ে সাজানো মাটির তৈরী ঘোড়া, হাতি, পুতুল, নৌকা, খেলনা শিশুদের হাড়ি পাতিলের পসরা ইত্যাদি।

মিষ্টির দোকানে বাতাসা, খেলানার, পেড়া, জিলেপি, রসগোল্লা ইত্যাদি। আর বেথুন, পেয়ালার মালা, তরমুজ, ফুট, কাঁচা আমা বিভিন্ন ফলফলাদি। কালীজিরা, মেথি ধনিয়া, মিষ্টি জিরা, তিল, তিশি পাটের বীজ ইত্যাদি বিশেষ আকর্ষণ বিন্নিধানের খৈ, শাপলা ভেটের খৈ। ছেলে-মেয়ের মধ্যে নতুন পোশাক পড়ার ধুম লেগে যেত। ব্যাবসায়ী দোকান গুলিতে পুজা,প্রসাদ বিতরণ চলতো। অতীতের বাংলার সংস্কৃতির রূপ কিছুটা বদলে গিয়েছে।

বাংলাদেশে এখন আর ইংরেজ নেই। জমিদারী প্রথাও উচেছদ হয়েছে। জমির মালিক সরাসরি সরকারি কাচারীতে দাখিলার মাধ্যমে খাজনার টাকা জমা দিচ্ছে। মারোওয়ারী ব্যবসায়ী না থাকাতে হাল খাতার উৎসব কমে গিয়েছে। মানুষের ভিতরে আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে বলে ব্যবসায় দেনা পাওনার হাল খাতাও কমে গিয়েছে। বাংলার হাজার বছরের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে বাঙলা বর্ষবরণ ও ১লা বৈশাখ মেলা, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুটা করে টিকিয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু হঠাৎ করে এই সংস্কৃতিকে মুছে দিতে এক শ্রেণীর বাঙালী অপসংস্কৃতি ডেকে কুকুর, শৃগালের ডাক অনুকরন করে বড় বড় চুল ঝাক্‌রিয়ে সংগীত পরিবেশন করে।

লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে গানের চেয়ে বাজনার শব্দে কান ঝালাপালা করে তুলে। গানের সুরে নেই কোন বাংলার সুমিষ্ট সুর। আবার এক শ্রেণীর লোক বাংলা গানের মিলন মেলা বর্ষবরণকে স্তব্দ করে দিতে রমনার বটমুলে বোমার আঘাত হেনে ইসলাম ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে ধর্মের ব্যবসায় মেতে উঠে। সেই তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের গড-ফাদারদের অধপতনে ফাঁসির কাঠে ঝুলতে হল। বাংলার মানুষ বাংলার সংস্কৃতি রক্ষায় রাষ্ট্রিয় মর্যাদা কখনো ভুলুণ্ঠিত হতে দেবেনা। যাদের মদতে এসকল অপকর্ম ঘটেছে তাদের খুঁজে বেড় করে বাংলাদেশে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

আগামী দিনগুলিতে বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে পারলে বাঙালীরা আবার নব উদ্যমে বৈশাখী মেলা। বর্ষবরণ করে হাসি ফুটাতে পারবে। বর্ষবরণে বোমাতংক থেকে শঙ্কিত না হয়ে মুক্ত কণ্ঠে গাইবে- এসা হে বৈশাখ এসো এসো আসুন সবাই মিলে বৈশাখের পুড়ো মাসটিতে পুর্বের মত গ্রাম-গঞ্জে মেলা বসিয়ে হরেক রকম পসরা সাজিয়ে তুলি। লুপ্ত প্রায় যাত্রা, সার্কাস, পুতুল খেলা, নাগরদোলাকে ফিরিয়ে আনি। তালপাখার বাতাস খাই, আর বাঁশের বাঁশীতে রাখালী সুর শুনি। পুণ্যাহর গল্প বলি, ব্যাবসায়ীদের হালখাতার উৎসবে মিষ্টি মুখ করি। আমাদের বর্ষবরণ, ১লা বৈশাখ সার্থক হউক।

সার্বজনীন মহোৎসব পহেলা বৈশাখ

নুরুন্নাহার (মুন্নি)

চৈত্রের গরম হাওয়ার ঘুর্ণি আর আগুনঢালা সুর্য তেতে ওঠে প্রকৃতিতে যখন দাহজ্বালা বিরাজ করছিলো আর তখনই বৈশাখ এলো। বৈশাখকে স্বাগত জানিয়ে ঋতুরাজ বসন্ত নিলো বিদায়। তাইতো আজ মন বলে ওঠে,

হে বৈশাখ,
এসেছ তুমি ওই দখিনের দুয়ার খুলে
বসন্ত সমীরণের বিরহী বিদায় দিয়ে
বাংলার বুকে, স্বপ্ন জাগরণে,
তোমাকে দেখেছি আজ নব আনন্দে
তোমাকে দেখেছি আজ সারা উদ্যমে।
তুমি মিশে আছো আজ
বঙ্গা ললনার ওই দেহ জুড়ে
তুমি গেঁথে আছো আজ কৃষ্ণকেশী খোপায়,
ফুটন্ত গোলাপ হয়ে,
তুমি চৈত্রকে করেছো ত্রাণ,
দিয়েছো প্রখরতার জলাঞ্জলী,
তুমি হিমেল হাওয়ার পুর্বদুত
অতীত মুর্ছনার অবসান।

জানা যায়, আজ থেকে প্রায় চারশত বছর পুর্বে মুঘল সম্রাট মহান অধিপতি আকবর ফসল তোলার সময় খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে হিজরী সনের সঙ্গে মিল রেখে বঙ্গাব্দ গণনার রীতি প্রচলন করেছিলেন। তখন ফসল ঘরে তোলার মাস অগ্রহায়ণকে ধরে বর্ষপঞ্জি তৈরি করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতো সবাই।

১লা বৈশাখে জমিদারগণ কর্তৃক খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে, প্রজাদের কৌশলে মিষ্টিমুখ করিয়ে খাজনা আদায়কে বলা হতো 'পুন্যাহ'। যদিও এই প্রথা এখন বিলুপ্ত প্রায়, তথাপিও পুর্ব রীতির সংগে তাল মিলিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে পহেলা বৈশাখ সার্বজনীন মহামিলনের অপার আনন্দের সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিয়ে যায়।

ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শহরে বর্ষবরণ উৎসবের সুচনা হয়েছিলো রাজধানী ঢাকায়। ১৯৬৭ সালে, ১৩৭২ বঙ্গাব্দে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অর্থাৎ রমানার বটমুলে শতায়ু প্রাঙ্গনে, মাত্র সাড়ে ছয়শত দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে ছায়ানটের প্রভাতী গানের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বর্ষবরণ উৎসবের পদচারণা শুরু হয়, যা আজ পর্যন্ত একই স্থানে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে কালের আর্বতনে এর অনেক পরিমার্জন, পরিবর্ধন হয়েছে। অতীতের পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে আজকের ন্যায় অতোটা চাকচিক্যতা ছিলোনা, একটু সাদামাটাভাবেই পালিত হতো। সময় গড়িয়ে নব যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে যেনো এখন ১লা বৈশাখের গায়ে।

শুরু থেকে মাঝপথে হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান স্থগিত থাকে। তারপর পুনরায় নব উদ্দীপনা নিয়ে যখন সামনে এগুতে যাচ্ছিল আর তখনই ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ ১৪০৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ এর অজানা অত্যাচারী, অশুভ হিংস্র বোমা হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ হারায় দশজন মানুষ। বাংলাদেশ টেলিভিশন রমনার বটমুল থেকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করছিলো। এই মর্মস্পর্শি, হৃদয়বিদারক, করুণ দৃশ্য, নিহতদের স্বজনদের আহাজারি, অকপটে তাঁদের আনন্দ উৎসুক দৃষ্টিকে অশ্রুভেজা সিক্ত দৃষ্টিতে পরিনত করেছিলো।

নিহত এই দশজনের ভেতর দু'একজন ঘাতক দলের বলে অনেকে মত পোষন করেছিলেন, আবার অনেকের দ্বিমতও ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সুষ্ঠু তদন্তের অভাবে ওই ঘাতকরা লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে যায়। তারপর থেকে প্রতিবছরই অত্যন্ত আনন্দ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হতে থাকে এই দিনটি। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জমজমাটভাবে পালিত হয়।

ছায়ানটের অনুষ্ঠান শেষে, চারুকলা ইনিস্টিটিউটের বকুলতলা থেকে দোয়েল চত্বর, মৎস্যভবন ও শিশুপার্ক প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্যে ছিলো মঙ্গল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় অধিকাংশের হাতে শোভা পেয়েছিলে বাঁশ-বেতের তৈরি বিভিন্ন দেশীয় জিনিসপত্র, একতারা, মাটির কলস, তালপাতার পাখা, বিরাটাকার শাপলা, দোয়েল অনেকের মাথায় ছিলো আবার মাটির তৈরি বড় এক কাঁঠাল। আবার ছোট মেয়েদের গ্রাম্য বধুবেশে পালকিতে করে বহন করতেও দেখা গেছে। সঙ্গত কারণেই শোভা যাত্রায় আরও শোভা পেয়েছিলো ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে নরখাদক বুশের ব্যাঙ্গাত্বক প্রতিকৃতির পোস্টার ও ফেস্টুন।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও রাজধানী ঢাকায় রমনার বটমূলে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখের সেই অনাড়াম্বর অনুষ্ঠান। ছায়ানটের তরুনী শিল্পিরা সাদা লালের বক প্রিন্টির শাড়িতে সাজবে বৈশাখী ঢংয়ে। কপালে পড়বে লাল রংয়ের গোল টিপ, হাতে পড়বে বৈশাখী চুড়ি, কানে আর গলায় থাকবে শাড়ীর রংয়ের সাথে মিলানো মাটির তৈরী দুল আর হার। খোঁপায় একগুচ্ছ গোলাপ এটে দিতেও ভুল করবেনা তারা। আর তরুন শিল্পীরা আসবে সাদা রংয়ের পাঞ্জাবী-পাজামা পরে, অনেকে আবার বৈশাখী রংয়ের লাল চুন্দ্রি ওড়নাও ছড়িয়ে দেন পাঞ্জাবীর ওপর। ঠিক একই সাজে সজ্জিত হয়ে আসেন প্রতিটি তরুণ-তরুণী।

শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী হাজার হাজার নারী পুরুষ যোগ দিবে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে। ভোর ছ'টায় শুরুহবে অনুষ্ঠান। অতীতের ব্যর্থতা আর গানি, কষ্ট, সকল কিছু ধুয়ে মুছে নব সাফল্য কামনায় প্রতিটি মানুষ বৈশাখকে বরণের মাধ্যমে শুরু করবেন তাঁদের প্রথম পদচারণা। সম্ভবত এবার ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ওয়াহিদুল হকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে এবং অনুষ্ঠানে বর্ষবরণে তাঁর গাওয়া প্রিয় গানগুলি বিভিন্ন শিল্পির কণ্ঠে প্রাধান্য পাবে। কিছুক্ষণ পরই শুরু হবে দেশীয় খাবারের মাধ্যমে বৈশাখী আপ্যায়ন, অর্থাৎ মাটির সানকিতে পান্তাভাত আর ইলিশভাজা খাওয়ার একটা হিড়িক পড়ে যাবে।

সেই সাথে আরো থাকবে, আলুর ভর্তা, বিভিন্ন ধরনের শুটকি মাছের ভর্তা। বিশেষ করে চ্যাপা শুটকি, গ্রাম বাংলায় যা হিদল শুটকি নামে বেশি পরিচিত, তারপর বেগুন ভর্তা, সরিষা ভর্তা, ইত্যাদি। কেউ কেউ হয়তো আবার বলে ওঠেবেন, সাথে একটা পোড়া মরিচ হলেতো মন্দ হতে না! একই খাবার বাংলার অধিকাংশ ঘরেও তৈরী হতে দেখা যায় এই দিনে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দেশীয় পিঠা তৈরী হয় সেখানে, যেমনঃ কুলি বা কুসুলি পিঠা, চিতই পিঠা, ছাইন্যা পিঠা, তেল পিঠা, হাতে কাটা সাজ পিঠা, ভাঁপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা ইত্যাদি।

এদেশে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের প্রবাসী নারী-পুরুষও আমাদের বর্ষবরণ উৎসবে যোগ দেয় শাড়ী-পাজামা-পাঞ্জাবী পরে এবং ছায়ানটের শিল্পীদের কণ্ঠে দেশীয় বিভিন্ন গান উপভোগ করে, দেশীয় খাবার খায় অর্থাৎ সর্বক্ষণ নিজেদের উৎসবে মাতিয়ে রাখে, মনে হয় এ যেনো তাদেরই উৎসব। ২ থেকে ৩ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠান পরিশেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তা শেষ হবে। অতঃপর প্রতিবারের ন্যায় এবারও চারুকলা ইনিস্টিটিউট থেকে বের হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা।

বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার উক্ত অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য এবং যেকোন ধরনের উৎশৃঙ্খলতা যেনো প্রশ্রয় না পায় সেজন্য সেনা সদস্যদের নিযুক্ত রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। ঢাকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।

আসছে ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ ১৪১৪ বঙ্গাব্দের বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আমাদের চাঁদপুর শহরসহ জেলার সর্বত্রই ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার ও বিশেষ কর্মকান্ডের আয়োজন করা হয়েছে প্রতিবারের ন্যায় এবারও চাঁদপুর

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ষবরণ উপলক্ষে সকালে চাঁদপুর ক্লাব প্রাঙ্গানে সকাল ৮টায় প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান বর্ষবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায় থাকবেন জেলা শিল্পকলা একাডেমী।

দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা ৬টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এছাড়া ললিতকলা, সংগীত নিকেতন, খেলাঘর আসর, গুয়াখোলা ক্রীড়াচক্র এবং রোটার‌্যাক্ট ক্লাবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন দিনব্যাপী কর্মসুচী হাতে নিয়েছে। নববর্ষের শুভাগমনের প্রারম্ভে চাঁদপুরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পিরা আলপনা একে সুসজ্জিত করে তুলবে শহরের প্রাণ কেন্দ্রের বিশেষ স্থান সমুহ। চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠ এবং হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গানে বিরাট পশরা বসবে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার। শত শত তরুন-তরুণী বৈশাখী সাজে সজ্জিত হয়ে আসবে এই উৎসবে যোগ দিতে। লাল রংয়ের শাড়ি পরে যখন তরুনীরা দল বেধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, তখন মনে হয় প্রতিটি সড়ক যেনো বসন্ত ঋতুর পলাশ ফুলে সজ্জিত হয়।

বৈশাখী মেলা, যা হৃদয়ের গভীরে পরম মমতায় এক সুখানুভূতির উদ্রেগ করে। প্রতিবছর নববর্ষের প্রথম দিনে দেশের সর্বত্রই এই মেলা সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতি জাকজমক ভাবেই শেষ হয়। তবে পুর্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলায়ই এই মেলার কদর লক্ষ্য করা যেতো কিন্তু বর্তমানে এই মেলা বিভিন্ন শহরের প্রান কেন্দ্রে স্থান করে নিয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে একদিন থেকে শুরু হয়ে এক সপ্তাহ, এমনকি একমাস পর্যন্ত ও এই মেলা চলে।

শহরাঞ্চলের মেলাতে দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হস্ত শিল্পীদের সুনিপুন হস্ত শিল্পের মনোরোম হাতের কাজে অলংকৃত মাটির তৈরী বিভিন্ন জিনসপত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী মেলায় স্থান পায়। গ্রাম বংলার বৈশাখী মেলায় একদিকে বিচিত্র ধরনের ছোট-বড় খেলনা, হাড়ি-পাতিল, মাটির তৈরী ছোট-বড় পাতিল, সরা, ব্যাঙ্ক, ইত্যাদির দোকান বসে। অন্যদিকে বসে নিম্কি, মুড়ুলি, বাতাসা, নারিকেলের সন্দেশ, চিড়া আর মুড়ির মোয়া ইত্যাদির দোকান।

জিলিপি দোকানে থাকে উপচে পড়া ভীড়। গরম গরম জিলিপি খেতে কার না ভালো লাগে! চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি গানের আসর বসে। সন্ধ্যার পর কোথাও কোথাও যাত্রাপালারও আয়োজন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে এই মেলা বসে বড় কোন বটতলায়, বাজারে কিংবা নদীর পাড়ে। ছোট-বড় সবাই মেলায় এসে বৈশাখী আনন্দে হয় পরি৩৪৫পুর্ণ।

পহেলা বৈশাখ শুভ হালখাতা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দিন। ঐতিহ্যের সঙ্গো তাল মিলিয়ে ব্যবসায়িক ও দোকানদারগণ তাঁদের বহু পুরাতন হালখাতা অর্থাৎ নতুন হিসাবের খাতা চালু করবে এবং ক্রেতা ও খরিদ্দারদের ঋণ পরিশোধ পুর্বক মিষ্টিমুখ করার আহবান জানাবে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরস্পর পরস্পরকে কার্ড ও উপহার সামগ্রী আদান প্রদানের মাধ্যমে বৈশাখী আনন্দে মুখরিত করে তোলে নিজেদের। এভাবে বাঙ্গালী এবং পহেলা বৈশাখ যুগ যুগ ধরে অন্তরঙ্গা হয়ে মিশে আছে এবং থাকবে অনন্তকাল।

বৈশাখী ছড়া
দেওয়ান আবদুল বাসেত

বর্ষবরণ ১৪১২বাঙলা

চৌদ্দশ’ বারো
তুমি বর্ণিল হও আরো।
তুমি এসো
পিড়ি পেতে বসো।

এসো তুমি হাল দুখীদের
ছন্দ নিয়ে,
তুমি এসো চৈতী ফুলের
গন্ধ নিয়ে।

তুমি এসো তালপাতার অই বাঁশির সুরে
ঘণকালো মেঘের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে।
তুমি এসো পান্তা-মরিচ
ইলিশভাজা হয়ে,
এই প্রবাসে তুমি এসো তিলের খাজা হয়ে।

বর্ষবরণ ১৪০৮ বাঙলা

(১৪০৮ বাঙলায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ঝরে যাওয়া তর-তাজা প্রাণগুলোর স্মরণে)

বোম ফাটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মুলে যাদের মরণ
কিন্তু ওরা কারা?

আমরা জানি কারা
কর্তা নাকি কর্ম করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন
বাঙলা এবং বাঙালিদের
ঘিন্না করে যারা।

বর্ষ শুরুর মাস
রক্তে আমার দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবে প্রতিবাদী
চাইবো তাদের লাশ!

ওরে আমার পাগলা বাউল
কাল্‌বোশেখীর ঝড়,
সপ্ত আকাশ নিয়ে তাদের

উপর ভেঙ্গো পড় !!

পরিচয়

আমার দাদা বীর ডুবুরী
উাবায় বাঘের টাগ,
দাদার দাদায় বন্ধু বানায়
বাঘের সঙ্গো ছাগ!
খালু ফুফা 'কীটস ও শেলী'
খালায় নভোচারী,
ইচ্ছে হলেই দিতে পারি
সপ্ত আকাশ পাড়ি।

হাসলি কেন? ফাজিল তোরা
বোকা ব্যাঙের ছানা,
আমার দাদার চাকর ছিলো
তোদের বাবার নানা!
বৃদ্ধ কোলা বললো রেগে-
ওরে বীরের ঝি-
সব পরিচয় পেলাম তবে
তোর পরিচয় কি?

সমাপ্ত